ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ (সকল পর্ব একত্রে)

বাংলাভাষী আলেমদের মাঝে অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি নাম ডক্টর খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গির।

সুবক্তা, সুলেখক হিসেবে পরিচিত, আস-সুন্নাহ ট্রাস্টের সাবেক কর্ণধার আল্লাহ’র ইচ্ছায় কিছুদিন আগে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন আল্লাহ্ তা’আলা উনাকে ক্ষমা করুন। আমীন।

মরহুম শায়খের লেখা “ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ” বইটি জামাতপন্থী, আধুনিক মানসিকতার মুসলিম ও কিছু নব্য ইরজাগ্রস্ত সালাফি ভাইদের মাঝে বেশ জনপ্রিয় ও রেফারেন্স বুক হিসেবে প্রসিদ্ধ।

আল্লাহ্তা’আলার সন্তুষ্টির জন্যই এই বইয়ে শায়খ কর্তৃক উল্লেখিত কিছু
তথ্যগত ও ইলমি ত্রুটি-বিচ্যুতি ধারাবাহিকভাবে পর্যালোচনার উদ্যেগ নেয়া হয়েছে, যাতে সাধারণ মুসলিমেরা বিভ্রান্তি থেকে বেঁচে থাকতে পারেন।

মরহুম শায়খকে হেয় করা কারো উদ্দেশ্য নয় আল্লাহ্ তা’আলার কাছে আশ্রয় চাই।

তা’আলা আমাদের প্রতিটি কাজ ইখলাসের সাথে আঞ্জাম দেয়ার তাওফিক দান করুন । আমীন।

খন্দকার জাহাঙ্গির রহঃ’র লিখিত বইয়ের ফিতনার ব্যাপারে লেখালেখির জন্য অনেক থেকে দু’আ ও ভালোবাসা পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ্‌আল্লাহ্ তা’আলা যেন এর বিনিময়ে আমাকে মাফ করেন। নতুন লেখা সময়-সুযোগের অভাবে না লিখতে পারলেও পূর্বের ৬টি লেখা একত্রে দেয়া হলো যাতে ভাইয়েরা সহজে পড়তে ও শেয়ার করতে পারেন।

তবে ১০ পর্যন্ত লিখে শেষ করার ইচ্ছা। একটা বইয়ের বড় বড় ১০টা ভুল থাকলে সেই বইয়ের আর কিছু থাকেনা। এরপর যার ইচ্ছা হয় সে গোমরাহির অনুসরণ করতে পারে।

আজ দেখলাম, খন্দকার রহঃ’র এক ভক্ত ভাইয়ের মতে জনৈক জিহাদির মাথা নাকি ভনভন করে ঘুরতে থাকে খন্দকার রহঃ’র বই পড়ে…

পূর্বে আমার এক ভাই জানালেন, খন্দকার রহঃ’র মুরিদেরা আমার পর্যালোচনা পড়ে আমাকে তাকফিরি-খাওয়ারিজ/ ইহুদিদের দালাল ট্যাগ লাগিয়েছেন যথাযথ জবাব দেয়ার পরিবর্তে… তথাপি, সত্য তো বলতেই হবে… ফি সাবিলিল্লাহ…

. এই সিরিজের লিখা পড়ে দুই একজন যদি এই দিক থেকে ফিরে আসতে পারেন তবে ততটুকুই ভালো।. তাও যদি না হয় তবে আমার সন্তান-পরিবার-আত্মিয়-পরিচিতদের কেউ যেন মুরজিয়াবাদের ফাদে না পড়েন এর জন্য লিখা আল্লাহ্ সহজ করুন। আমিন।

১ম পর্বঃ

বইটির ভূমিকায় মরহুম লেখকের (ড. খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গির) শ্বশুর ফুরফুরা পীর সাহেব লিখেছেন,

“বিড়ালকে অভুক্ত বেঁধে রাখার জন্য কঠিনতম নিন্দা জানিয়েছেন যে মহানবী সাঃ তাঁর উম্মতের কেউ ইসলামের নামে মানুষ খুন করতে পারে একথা কল্পনাও করতে পারি না।” (ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ, পৃষ্ঠা ৩)

তা’আলা বলেন,

“অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও।

নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।“ [সুরা তাওবা: ৫]

“তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়।“ [সুরা বাকারাঃ ২১৬] .

উপরোক্ত আয়াত দুটি ছাড়াও কুর’আনের কয়েক’শ আয়াত ও সহস্রাধিক হাদিস দ্বারা প্রমাণিত শুধুমাত্র ইসলামের নামেই মানুষ হত্যা করা জায়েজ বরং ক্ষেত্রবিশেষে তা অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের ফরজ ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আমিরুল ইত্তিহাদ এটা জানবেন না, এটা মনে করা উনার ব্যাপারে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করা বৈ অন্য কিছুই নয়।

ধরে নেয়া যাক, উনি ‘ইসলামের নামে খুন’ বলতে কুর’আনের আয়াত ও হাদিসের ভুল ব্যখ্যা করে অন্যায়ভাবে শারিয়া বহির্ভূত হত্যা করাকে বুঝিয়েছেন। কিন্তু দেখুন, সাধারণভাবে উনার এই কথা আম মানুষের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিতে পারে যে, ইসলামে হত্যা বলতে কিছুই নেই।

উনার এই উক্তিটি ভুল হিসেবে উল্লেখিত করা হচ্ছে না। বরং, ইসলামে হত্যা বলতে কিছুই নেই এমন চুড়ান্ত ভ্রান্ত ধারণা যাতে সাধারণের মস্তিস্কে ঠাই না পায় তা পরিষ্কার করাই ছিল উদ্দেশ্য।

কেননা কোনো ব্যক্তি যদি শুধু যুদ্ধ ও হত্যা সংক্রান্ত আয়াত/হাদিস সামনে এনে ঘোষণা দেয় যে, “ইসলামে ক্ষমা ও শান্তি বলে কিছু নেই, আছে শুধু যুদ্ধ”!

তবে কি তাঁকে ভ্রান্ত বলা হবে না?

একজন ‘স্বনামধন্য’ আলেম ও উনার গুনমুগ্ধ অনুসারীদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা থাকবে সাধারণ মানুষের কাছে বক্তব্য তুলে ধরার সময় শারিয়াহ’র কোনো আহকামের ব্যাপারে যাতে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা হবে।

২য় পর্বঃ

আলহামদুলিল্লাহ! মরহুম শায়খ খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গির ”ইসলামের নাম জঙ্গিবাদ” নামক বইয়ের প্রথম পরিচ্ছদে (পরিচিতি ও আলোচিত কারণ) শুরুর দিকে সন্ত্রাসের আভিধানিক অর্থ বিশ্লেষণ ও মুসলিম দেশসমূহের উপর মার্কিন-ইজরায়েলি আগ্রাসনের ব্যাপারে চমৎকার কিছু আলোচনা করেছেন।

এবং প্রমাণ করেছেন, সন্ত্রাসের সংজ্ঞা একেক জনের কাছে একেক রকম। যেমন — ইজরায়েলিদের কাছে ফিলিস্তীনিরা সন্ত্রাসী, আবার ফিলিস্তীনিদের কাছে ইজরায়েলিরা সন্ত্রাসী।

পৃষ্ঠা ৯ এ ডক্টর খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর উল্লেখ করেছেন,

“এভাবে আমরা দেখছি যে, সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীকে চিহ্নিত করা কঠিন এবং এবিষয়ে ঐক্যমত পোষণ প্রায় অসম্ভব।”

একটু নিচে তিনি আবার একটি প্রবাদ উল্লেখ করে উনার বক্তব্যের সারাংশ টেনেছেন,

“One man’s terrorist is another man’s freedom fighter”.

আলেম কেন, একজন মুসলমানের কাছেও তো আমাদের দাবী তো এই যে, তার কাছে শত্রু-মিত্র চিহ্নিত করার মানদন্ড হবে আল্লাহ্* সুবহানাহু ওয়া তা’আলার কিতাব। যা শারিয়াহ’র পরিভাষায় আল-ওয়ালা ওয়াল বা’রা হিসেবে অভিহিত।

কিন্তু একজন আলেম হয়েও তিনি প্রমাণ করতে চাইলেন, সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীর সংজ্ঞা আপেক্ষিক।

অথচ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা প্রকৃত সন্ত্রাসী/অপরাধী কারা এবং ন্যায়সঙ্গত মুসলিমদের সাথে তাদের আচরণ কেমন হয়/হবে তা বারংবার আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন,

“তারা সর্বদা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যে পর্যন্ত না তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দেয়।” [সূরা বাকারা ২:২১৭]

“এইরূপে আমি প্রত্যেক জনপদে সেখানকার অপরাধী প্রধানদেরকে চক্রান্ত করার অবকাশ দিয়েছি।” [সূরা আন’আম ৬: ১২৩]

“যারা অপরাধী তারা তো মু’মিনদেরকে উপহাস করত।” [সূরা মুতাফ্ফিফীন ৮৩:২৯]

“ফিরাউন বলল, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্যা করি এবং সে তার প্রতিপালকের স্মরণাপনড়ব হোক। আমি আশংকা করি যে, সে তোমাদের দ্বীনের পরিবর্তন ঘটাবে অথবা সে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।” [সূরা মু’মিন ৪০:২৬]

“তারা বললঃ আমরা কি তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব অথচ নিচু শ্রেণীর লোকেরা তোমার অনুসরণ করছে।” [সূরা শূরা ২৬:১১১]

“তার সম্প্রদায়ের কাফির প্রধানরা বললঃ ‘তোমরা যদি শুআ’ইবকে অনুসরণ কর তবে তোমরা তো ক্ষতিগ্রস্থ হবে’।” [সূরা আ’রাফ ৭:৯০]

“ফিরাউন বললঃ আমি যা বুঝি, আমি তোমাদেরকে তাই বলছি। আমি তোমাদেরকে কেবল সৎপথই দেখিয়ে থাকি।” [সূরা মু’মিন ৪০:২৯]

“কাফিররা তাদের রাসূলগণকে বলেছিলঃ আমরা তোমাদেরকে অবশ্যই আমাদের দেশ থেকে বহিষ্কৃত করব।” [সূরা ইব্রাহীম ১৪:১৩]

কিন্তু! অজ্ঞাত কারণে ডক্টর খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীর সংজ্ঞায়নে কুর’আনকে সামনে আনেন নি। মানদন্ড হিসেবে বইয়ের পরবর্তী অংশে কুর’আন ও সুন্নাহ’র আংশিক আলোকপাত থাকলেও মূল প্রশ্নে কুর’আন-সুন্নাহ থেকে একটি অক্ষরও উল্লেখিত হলো না। কেন? ওয়াল্লাহু আ’লাম।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা কুর’আনে পরিষ্কার করেছেন সামগ্রিকভাবে কুফফার ও মুসলিমরা ঐক্যমতে পৌঁছাতে পারেনা।

“’আর আল্লাহ চাইলে তিনি তাদের এক উম্মত বানিয়ে দিতেন, কিন্তু তিনি যাকে চান নিজ কৃপার অন্তর্ভুক্ত করেন।“ (সুরা আশ শুরা: ৮)

“ইয়াহুদী-খৃষ্টানরা কখনই তোমার উপর সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষণ না তুমি তাদের দ্বীনের অনুসরণ কর।“ [সূরা বাকারা: ১২০] । । ।

এই আয়াত দুটি এত বড় আলেমের জানা থাকারই কথা। প্রশ্ন হচ্ছে এমনটা জানার পরও ডক্টর খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর ‘সন্ত্রাস’ ও ‘সন্ত্রাসী’ চিহ্নিতকরণে ঐক্যমত কেন খুজলেন?

এছাড়াও প্রশ্ন থেকে যায় শার’ঈ আলোচনা করা হয়েছে এমন একটি বইয়ে শ্রদ্ধেয় শায়খ কুর’আনের আয়াতের ব্যবহার না করে শুধুমাত্র নামসর্বস্ব কিছু উক্তি ও তথ্যের আলোকে কেন এই চিরন্তন সত্যটি কিছুটা পরিবর্তন করে নতুন করে প্রমাণ করতে চাইলেন?

যদি এমন হতো যে বইটি অমুসলিমদের জন্য লেখা. এবং তাদের জন্য কুর’আন-সুন্নাহ থেকে কোনো উদ্ধৃতি চয়ন করা থেকে তিনি বিরত থেকেছেন তাহলে কোনো প্রশ্ন থাকতো না। অথচ, বইয়ের পরবর্তী অংশে তিনি অসংখ্য শার’ঈ নুসুস, সালাফদের মতামত ও ইসলামী ইতিহাসের খুটিনাটি তুলে ধরেছেন।

সম্পূর্ণ ১.১.১ অধ্যায় পড়ার পর সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করে নিবে যে তিনি আসলে, সাম্রাজ্যবাদী ও ‘মৌলবাদী’ উভয়কেই দোষী সাব্যস্ত করেছেন।

উভয়কেই সন্ত্রাসী সাব্যস্ত করেছেন। ‘সন্ত্রাস’ ও ‘সন্ত্রাসী’ চিহ্নিতকরণে ডক্টর সাহেব যদি একটি কুরআনের আয়াতও মানদন্ড হিসেবে উল্লেখ করতেন তবে পাঠকের কাছে সাম্রাজ্যবাদী ও মৌলবাদী উভয়পক্ষকে দোষী সাব্যস্ত করা যেত না, অন্তত পাঠকদের বড় একটি অংশের কাছে।

বাস্তবতাও তাই! জ্ঞানের ভারে ন্যুব্জ শায়খ খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীরের সুপাঠ্য লেখা পড়তে পড়তে পরিচ্ছদ শেষে পাঠকের অবচেতন মন হয়েছে প্রভাবিত। ওয়াল্লাহু ‘আলাম।

৩য় পর্বঃ

পৃষ্ঠা ৯ এর মাঝামাঝি শায়খ (তা’আলা উনাকে মাফ করুন) উল্লেখ করেছেন,

“ইরাকে প্রতিরোধ যোদ্ধা বা শিয়া-সুন্নি সঙ্ঘাতে লিপ্ত বিভিন্ন দল নিরস্ত্র অযোদ্ধা মানুষদের হত্যা করলে তাকে সকলেই সন্ত্রাস বলে গণ্য করেন। কিন্তু মার্কিন বাহিনী ফালুজা এবং অন্যান্য স্থানে অযোদ্ধা নিরস্ত্র মানুষদেরকে হত্যা করলে তাকে সন্ত্রাস বলে কখনোই স্বীকার করা হয় না।”

প্রথমত, ২০০৩ সালে মার্কিন-ন্যাটো জোট বিনা উস্কানিতে ইরাক আক্রমণ করে। এর পেছনে কোনো প্রকার ‘জঙ্গিবাদী’ উস্কানি ছিল না। সাদ্দাম হোসেন পরবর্তী সময়ে রাফেজি দালাল নুরি আল মালিকিকে ক্ষমতায় বসায় মারকিন-ন্যাটো নীতিনির্ধারকরা যাদের নির্দেশে ইরাকের আহলুস সুন্নাহ ও মুজাহিদিনদের উপর আগ্রাসন চালায় রাফেজি সৈন্যবিশিষ্ট ইরাকি আর্মি।

ইরাকের যুদ্ধ ছিল মার্কিন-ন্যাটো জোট ও তাদের সৃষ্ট পুতুল ইরাকি আর্মির বিরুদ্ধে। এটা কখনোই নিছক ‘শিয়া-সুন্নি সংঘাত’ ছিল না।

উনি নিজেও ইতোঃপূর্বে ইরাকে আমেরিকার আগ্রাসনের কথা উল্লেখ করেছেন! কি নিদারুণ স্ববিরোধীতা!

“তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর।” — সুরা আন-নামল, ২৭ঃ৬৪

ডক্টর খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর মুসলমানদের রক্তের ব্যাপারে চরম ঔদাসিন্য দেখিয়েছেন। যদি উনার জানার সল্পতা থাকত উনি কেন এটা লিখতে গেলেন?

আর যদি জেনেশুনে এভাবে নিহত মুসলমান ও সম্ভ্রমহারা বোনদের গায়ে এমন অপবাদ দিয়ে তবে আল্লাহ্ তা’আলা যেন উনার ফয়সালা তদানুজায়ী করেন।

সুবহান’আল্লাহ! ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনের ফলে নিহত হয় দশ লক্ষাধিক নিরীহ বেসামরিক মানুষ। মাহমুদিয়া গ্রামে ১৪ বছরের বোন আবির আল জানাবি (রাহিমাহুল্লাহ) কে ধর্ষণের পর গোটা পরিবারসহ জ্বালিয়ে দেয়ার ঘটনা জানে না এমন কে আছে?

বিশেষ করে দুনিয়ার এত খবর রাখা, বৈশ্বিক ‘জঙ্গিবাদের’ উপর বই লেখা একজন ব্যাক্তি তা জানবে না এটা কিভাবে সম্ভব??

এত কিছুর পরও উনি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, কোনো মানুষ বা মানবগোষ্ঠীকে ‘সন্ত্রাসী’ বলে চিহ্নিত করা খুবই কঠিন। (লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ)

তবে উনার কাছে কঠিন মনে হলেও পরবর্তীতে উনি সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত করেছেন এবং তাদের উপর পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখে গিয়েছেন।

অথচ লক্ষ লক্ষ মুসলমানের রক্ত ঝরানো, আবু গারিব কারাগারে সম্ভ্রান্ত-রক্ষনশীল মুসলিম বোনদের দৈনিক দশবার ধর্ষণ করা সত্ত্বেও উনি আমেরিকানদের ‘সন্ত্রাসী’ হিসেবে চিহ্নিত করাকে খুবই কঠিন মনে করছেন।

জঙ্গি-সন্ত্রাসী শব্দের স্বরূপ উদ্ঘাটনের চেস্টায় যদিও তিনি দেখিয়েছেন কাউকে ‘সন্ত্রাসী’ বা ‘জঙ্গি’ আখ্যায়িত করাটা কঠিন; তথাপি তিনি হঠাৎ করেই যেন জঙ্গি কারা তা খুজে পেয়েছিলেন এবং পরবর্তী পরিচ্ছদগুলোতে অবলীলায় ‘জঙ্গি’ শব্দের ব্যবহার করেছেন।

৪র্থ পর্বঃ

মরহুম শায়খ পৃষ্ঠা ৯ এর শেষে উল্লেখ করেছেন

“যুদ্ধের ক্ষেত্রেও উভয়পক্ষ প্রতিপক্ষের সৈন্য ও নাগরিকদের মধ্যে ভীতিসঞ্চারে সচেষ্ট থাকে। তবে সন্ত্রাসের সাথে যুদ্ধের মৌলিক পার্থক্য হলো, সাধারণ যুদ্ধ ও গেরিলা যুদ্ধ উভয় ক্ষেত্রেরই যোদ্ধারা মূলত যোদ্ধা বা যুদ্ধবিষয়ক লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করতে সচেষ্ট থাকে এবং সামরিক বিজয়ই লক্ষ্য থাকে। পক্ষান্তরে সন্ত্রাসের ক্ষেত্রের সামরিক বিজয় উদ্দেশ্য থাকে না।

এক্ষেত্রে মূল উদ্দেশ্যেই হলো সামরিক-অসামরিক নির্বিচারে সকল লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করে ভীতি সঞ্চারের মাধ্যমে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করা।”

বরাবরের মতই মরহুম শায়খ পূর্বের লাইনের সাথে পরের লাইনের সামঞ্জস্য দেখাতে পারেন নি। অধমের কাছে বোধগম্য নয়, শায়খ শুরুতে বললেন সন্ত্রাসী/সন্ত্রাস কাদের/কাকে বলা হয় তা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

কিন্তু এই প্যারাতে দেখা যাচ্ছে যে, শায়খ খুজে পেয়েছেন। কিভাবে, কোথা থেকে উল্লেখিত তাও পরিষ্কার করা হয়নি। কিন্তু শায়খ এখানে একটি সংজ্ঞায়ন করেছেন, যদিও এটার কোনো সুত্র উনি উল্লেখ করেন নি।

স্পষ্টতই কুর’আন-সুন্নাহ’র আলোকে এই সংজ্ঞাটি সনদের ক্ষেত্রে সদা সতর্ক শায়খ দেন নি। তাই এই সংজ্ঞাটি উনি কোথা থেকে পেলেন তা স্পষ্ট নয়।

সুবহান’আল্লাহ! আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনার প্রয়োজন আছে। কেননা ১/২ লাইনের মারপ্যচেই পাঠককে বিভ্রান্ত করা হয়। বিশেষ করে যে বই ভ্রান্তির উপর লিখিত, সে বইয়ের প্রতিটি লাইন কখনোই প্রমাণিত করা সম্ভব না।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি আমি পাঠকদের মনোযোগের সাথে বিশ্লেষণের আহ্বান জানাব তা হচ্ছে, তা’আলার রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি শুধুমাত্র রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করেছেন?

রাষ্ট্রের ধারণাই তো তৎকালীন সময়ে এত ব্যাপকভাবে ছিল না।

বনি কুরাইজার বিরুদ্ধে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আচরণ অবশ্যই হাদ্দ কিংবা ক্কিসাস নয়। কেননা তাদের অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যাক্তি এবং নারী ছাড়া বাকী সবাই অবশ্যই যুদ্ধে শরিক হয়নি। এবং তাদেরকে যুদ্ধ চলাকালীনও হত্যা করা হয়নি।

শায়খের সংজ্ঞানুযায়ী একে কোনোভাবেই যুদ্ধ বলা যায় না।

শায়খ প্রদত্ত সংজ্ঞানুযায়ী একে যদি কিছু বলতে হয় তবে ‘সন্ত্রাস’ই বলতে হয়। লা ওয়ালা ক্কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। আল্লাহ্ তা’আলা শায়খকে ক্ষমা করে দিন। আমীন।

এছাড়াও আরও তিনটি বিষয় আলোচনা করা হলো –

১/ স্ববিরোধী বক্তব্যঃ শায়খ লিখেছেন, যুদ্ধের ক্ষেত্রেও উভয়পক্ষ প্রতিপক্ষের সৈন্য ও নাগরিকদের মধ্যে ভীতিসঞ্চারে সচেষ্ট থাকে।

আবার নিচে লিখেছেন, পক্ষান্তরে সন্ত্রাসের ক্ষেত্রের সামরিক বিজয় উদ্দেশ্য থাকে না। এক্ষেত্রে মূল উদ্দেশ্যেই হলো সামরিক-অসামরিক নির্বিচারে সকল লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করে ভীতি সঞ্চারের মাধ্যমে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করা।

সৈন্য ও নাগরিক দ্বারা কী উদ্দেশ্য? স্বাভাবিকভাবেই এটা বুঝে আসে যে, সৈন্য হচ্ছে সামরিক ব্যক্তিত্ব এবং নাগরিক হচ্ছে বেসামরিক ব্যক্তিত্ব। এছাড়াও, শায়খ এখানে “এবং” অব্যয় ব্যবহার করেছেন যা দ্বারা স্পষ্টতই বুঝে আসে যে, যুদ্ধে বেসামরিকদের আক্রমনও করা হয় ভীতিসঞ্চারের উদ্দেশ্যে।

পরবর্তী বক্তব্যের সাথে তাই সংঘর্ষ হচ্ছে। কেননা সন্ত্রাসের উদ্দেশ্যও সামরিক-বেসামরিকদের মাঝে ভীতিসঞ্চার করা।

বাকী থাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করার বিষয়টি। এমন কোনো ব্যক্তি দুনিয়ার বুকে রয়েছে কি, যে বলবে যুদ্ধের উদ্দেশ্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করা নয়?

মূলতঃ এই স্পষ্টতই স্ববিরোধী বক্তব্য থেকে বুঝে আসে যে, মরহুম শায়খ শুধুমাত্র কলম চালিয়েছেন এবং উনার গুনমুগ্ধ ভক্তরা শুধু পড়েই গিয়েছেন। যাচাই-বাছাই কিংবা সত্যানুসন্ধানের মেজাজ লেখক-পাঠক উভয়ের মাঝেই ছিল অনুপস্থিত।

২/ সন্ত্রাসের অসম্পূর্ণ সংজ্ঞাঃ

যে ব্যক্তি টাকার বিনিময়ে খুন করে তাকে কি আমরা সন্ত্রাসী বলি না?

ছিনতাইকারী/চাঁদাবাজদের কে কি সন্ত্রাসী বলা হয় না?

যদি এদের সন্ত্রাসী বলা হয়, তাহলে পাঠকের কাছে প্রশ্ন থাকে — টাকার বিনিময়ে খুন করা কিংবা ছিনতাই করার মাঝে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কিভাবে হাসিল হয়!?!

অর্থাৎ, সংজ্ঞাটি অসম্পূর্ণ। বেখেয়াল ব্যক্তি কিংবা শায়খের গুনমুগ্ধ পাঠকমাত্রই বিষয়টি এড়িয়ে যাবেন।

কিন্তু এমন প্রশ্ন তো আসাটা একেবারেই স্বাভাবিক ছিল যে, কেন শায়খ কুর’আন-সুন্নাহ’র চিরন্তন মানদন্ডকে বাদ দিয়ে জোর করে এমন একটি সংজ্ঞা দাড় করাতে চাইলেন যে সংজ্ঞায় কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত মুসলিমদের সন্ত্রাসীরূপে চিত্রায়িত করা যায়?

৩/ একচোখা বিশ্লেষণঃ

শায়খ বলেছেন,

“সাধারণ যুদ্ধ ও গেরিলা যুদ্ধ উভয় ক্ষেত্রেরই যোদ্ধারা মূলত যোদ্ধা বা যুদ্ধবিষয়ক লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করতে সচেষ্ট থাকে এবং সামরিক বিজয়ই লক্ষ্য থাকে।“

যে বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য তা হচ্ছে, যে কোনো দল কিংবা সামরিক শক্তি অবশ্যই প্রতিপক্ষকে দুর্বল করার চেষ্টায় থাকে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

তানজিম আল-কায়দা থেকে শুরু করে গোটা দুনিয়াতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ছোট-মাঝারি-বড় সকল দলেরই উদ্দেশ্য থাকে সামরিক বিজয়। শায়খ যদি বলেন যে, এদের সামরিক বিজয় অর্জন করা লক্ষ্য নয় তবে, আফগানিস্তান-সিরিয়া-সোমালিয়া-মালি-ইয়েমেনেসহ অন্যান্য জিহাদি মারেকাগুলোর দিকে পাঠকদের সজাগ দৃষ্টিপাত করার আহ্বান জানাচ্ছি, যা শায়খের উক্ত বক্তব্যের অসারতা স্পষ্ট করে তুলবে।

সন্ত্রাসের সংজ্ঞায়নে শায়খ বলেছেন, এক্ষেত্রে মূল উদ্দেশ্যেই হলো সামরিক-অসামরিক নির্বিচারে সকল লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করে ভীতি সঞ্চারের মাধ্যমে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করা।

আমি পাঠকদের অনুরোধ করব, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস অধ্যায়ন করতে।
কেননা এদুটো শুধু যুদ্ধ হিসেবেই স্বীকৃত নয়, বরং বিশ্বযুদ্ধ হিসেবে স্বীকৃত। দুটি যুদ্ধেই গণহারে নিহত হয়েছে কয়েক লক্ষ বেসামরিক ব্যক্তি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে শুধু বেসামরিক ইহুদিই হত্যা করা হয়েছে ছয় মিলিয়ন।

নিঃসন্দেহে বিশ্বযুদ্ধগুলোতে সামরিক ব্যক্তির চেয়ে অনেকগুন বেশী বেসামরিক ব্যক্তি আক্রমণের শিকার হয়েছে। জাপানে আণবিক বোমার মাধ্যমে আমেরিকা হত্যা করেছে কয়েক লক্ষ জাপানি। যাদের প্রায় সবাইই ছিল বেসামরিক।

এছাড়াও নানকিং ও জাপানি গ্রামগুলোতে মিত্রবাহিনীর গনধর্ষণের কথা তো রয়েই গেলো। এখন, প্রশ্ন থেকে যায় — ইতিহাসের বইগুলোতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কী হিসেবে উল্লেখিত? সন্ত্রাস নাকি যুদ্ধ?

অবশ্যই এখানে নির্বিচার হত্যার পক্ষে সাফাই গাওয়া হচ্ছে না। মূলতঃ সন্ত্রাস ও যুদ্ধের সংজ্ঞায়নে মরহুম শায়খের বিশ্লেষণের ফাঁক তুলে ধরাই উদ্দেশ্য।

উপরন্তু দেখুন, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শান্তিকামী আমেরিকা এবং তার মিত্ররা মাত্র কয়কে বছরে ৪০ লক্ষ মুসলিম হত্যা করেছে। এবং এখনো চলছ। একেও বলা হচ্ছে যুদ্ধ। সন্ত্রাস বলা হচ্ছে না।

এর আগে নব্বইয়ের দশকে আমেরিকা কর্তৃক ইরাকের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞার কারণে অনাহারে মারা যায় প্রায় ১০ লক্ষ মুসলিম শিশু ‘সন্ত্রাসী। কিন্তু একেও তো বলা হয় উপসাগরীয় যুদ্ধ। সন্ত্রাস তো বলা হচ্ছে না।

সিরিয়াতে রাশিয়া, তুরস্ক, আমেরিকা গণহারে এয়ার রেইডের মাধ্যমে সহস্রাধিক নারী- শিশু হত্যা করছে।

ইয়েমেনে আরব আমিরাত, সৌদি আরব হত্যা করেছে কয়েক হাজার আহলুস সুন্নাহ’র মুসলমান। ইয়েমেনে একদিনেই এক বিয়েবাড়িতে সৌদি জঙ্গি বিমানের আক্রমণে শহিদ হয় ১৫০’র মত মুসলমান!!

প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে, কেন এটা ‘ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ’ হয় না!??!

দেখুন, পশ্চিমাদের সন্ত্রাস/সন্ত্রাসীর সংজ্ঞায়ন দ্বারা মরহুম শায়খ প্রভাবিত হয়েছেন কি না? (যদিও, কয়েক লাইন পরেই উনি অবশ্য সরাসরি পশ্চিমা সংজ্ঞা উদ্ধৃতি করে তার স্বপক্ষে বক্তব্য পেশ করেছেন।)

উনি পূর্বে লম্বা আলোচনা করে দেখালেন সন্ত্রাসের যথাযথ সংজ্ঞায়ন সম্ভব নয়, অথচ পশ্চিমারা মুসলিম রক্তপ্রবাহের গ্রহণযোগ্যতা আদায়ে সন্ত্রাসের যেভাবে সংজ্ঞা দিয়ে থাকে দুঃখজনকভাবে তিনিও একই সংজ্ঞা দিয়ে দিলেন… উদ্দেশ্য আশা করি পাঠকের কাছে স্পষ্ট।

মরহুম শায়খের এই সংজ্ঞায়নের উপরই বইয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছে। অথচ উনার সংজ্ঞায়নের বিশ্লেষণ হয়েছে কাফিরদের সন্ত্রাস হাল্কাভাবে নেয়া ও মুসলমানদের সন্ত্রাসী প্রমাণ করার একচোখা নীতির উপর।

ওয়ালা হাওলা ওয়ালা ক্কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

৫ম পর্বঃ

শায়খ খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গির বলেন,

“মদীনার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর নেতৃত্বে মুসলিমগণ অনেক ‘কিতাল’ করেছেন। যুদ্ধের ময়দান ছাড়া কাফিরদের দেশে যেয়ে গোপনে হত্যা, সন্ত্রাস, অগ্নিসংযোগ,বিষপ্রয়োগ কখনোই তিনি করেন নি বা করার অনুমতি দেন নি।”

— ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ, পৃষ্ঠা ৪৯

১) হজরত উসামা বিন জায়েদ রাদিঃ বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে ফিলিস্তিনের উবনা এলাকার উপরে ভোরে আক্রমন করে তাদের ঘরবাড়ি জালিয়ে দেবার আদেশ দিলেন এবং বললেন,”আল্লাহ’র নামে রওনা হয়ে যাও।”

(মুখতাসার ইবনে আসাকির, হায়াতুস সাহাবা, ২/৪৭) . .

২) চতুর্থ হিজরীর মহররম মাসে খালিদ বিন আবু সুফিয়ান হুজালি মুসলিমদের উপর হামলার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে জানার পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস রাদিঃ খালিদ বিন আবু সুফিয়ান হুজালিকে গুপ্তহত্যা করেন এবং তার মাথা কেটে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নিয়ে আসেন।

রাসুল সাঃ গুপ্তহত্যাকারী সাহাবিকে একটি লাঠি দিয়ে বলেন,

“কিয়ামতের দিন এটি তোমার ও আমার মাঝে নিদর্শন হিসেবে থাকবে।”

(যাদুল মা’আদ, ২/১০৯; সীরাতে ইবনে হিশাম ২/৬১৯-৬২০) . .

৩) রাসুলুল্লাহ (সা) এর সময়ে ‘বায়াত’ নামক এক ধরনের যুদ্ধ পদ্ধতি ছিল। এটা ছিল রাতের অন্ধকারে শত্রুপক্ষের উপর হামলা করা। আক্রমণকারীরা অতর্কিতভাবে শত্রুদের বাড়িঘরে কিংবা তাবুতে হামলা করত এবং লড়াইয়ে লিপ্ত হত।.

এ কারণে ঘরে কিংবা তাবুতে অবস্থানরত নারী-পুরুষ- শিশু নির্বিশেষে নিহত হত কারণ এর মাঝে নারী-পুরুষ-শিশু পার্থক্য করা খুবই কঠিন। এখন, এ ধরণের যুদ্ধ কি ইসলাম অনুমোদন করে? . ‘বায়াত’ যুদ্ধে নারী-শিশুরা যে হামলার শিকার হচ্ছে এ ব্যপারে রাসুলুল্লাহ(সা) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল।

একটি সহিহ বর্ণনায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন “তারা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত”। (সহিহ মুসলিম)

অর্থাৎ হত্যার অনুমতির ব্যাপারে যুদ্ধরত পুরুষদের উপর যে হুকুম তাদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ।

রাসুলুল্লাহ (সা) তাঁর সাহাবীদের এই ধরনের যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করেছেন যেখানে পুরো পরিবারই নিহত হচ্ছে। সালামাহ(রা) বলেছেন ‘আমি নিজে নয়টি পরিবারের সকল লোককে হত্যা করেছি।’ . (আল-তাবারানি) . . ৪)

ইবনে রুশদ বলেন, এই ব্যাপারে আলেমগণের ইজমা আছে যে কাফেরদের দুর্গে গুলতি দিয়ে আক্রমন করা বৈধ যদিও তাদের মাঝে নারী –শিশু থাকুক কিংবা না থাকুক।.

কারণ আমাদের নিকট দালিল আছে যেখান থেকে জানতে পারি রাসুল (সা) তায়িফে কাফেরদের বিরুদ্ধে গুলতি ব্যবহার করেছিলেন।

(বিদায়াত আল-মুজতাহিদ) . .

আলোচনা সংক্ষিপ্ত রাখার উদ্দেশ্যে এখানেই থামা হলো। খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গিরকে আল্লাহ্‌ ক্ষমা করুন। উনার বইয়ের বিকল্প বই পাওয়া গেলে উনার বই বিতরণ, ক্রয় , পঠন ত্যাগ করাই উত্তম … . .

আল্লামা মুহাম্মাদ ইব্‌ন সিরিন রাহিমাহুল্লাহ্‌ বলেন :

"অতএব পরখ করে দেখো কার থেকে তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করছো !" (শামায়েলে তিরমিজির শেষ হাদিস , মাওকুফ)

পর্ব ৬ঃ

খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গির রহঃ পৃষ্ঠা ৪৯ এ লিখেছেন -

রাষ্ট্রের বিদ্যমানতা ও রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি বা নির্দেশ জিহাদের বৈধতার শর্ত বলে উল্লেখ করে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন: الإمام جنة يقاتل من ورائه। "রাষ্টপ্রধান ঢাল, যাকে সামনে রেখে যুদ্ধ পরিচালিত হবে। " (ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ , পৃষ্ঠা ৪৯)

প্রথমত , হাদিসের অর্থ বিকৃত করেছেন - . ইমাম শব্দের শাব্দিক অর্থ নেতা। হাদিসের অর্থ এভাবে পরিবর্তন করা অনুচিত। নিশ্চয়ই সালাতের ইমাম বলতে , হাজ্জের ইমাম বলতে আমরা সরাসরি রাস্ট্রপ্রধান বুঝে থাকি না !

উনি হাদিসের অর্থ লিখে অতঃপর ব্যখ্যা করতে পারতেন। কিন্তু ইমাম শব্দের অর্থ রাস্ট্রপ্রধান কখনই হয় না। নিচে বিষয়টি আরও স্পষ্ট করা হয়েছে … . . দ্বিতীয়ত , তিনি বলে দিচ্ছেন অবলীলায় যে , রাসুল (সাঃ) জিহাদের বৈধতার জন্য রাষ্ট্রপ্রধানকে শর্ত হিসেবে বুঝিয়েছেন এই হাদিসে !! . কোথায় পেলেন এই শর্ত !! কোথায়? কোন ফিকহের কিতাব ?

কোন মুহাদ্দিস এই কথা বলেছেন !! রাস্ট্রপ্রধান শব্দটি কোথায় আছে !!?? . . আল্লাহ্‌ 'র রাসুল সাঃ এর নামে মিথ্যাচার ছাড়া কিছুই না … কারণ হুবহু একই শব্দ এসেছে আরেকটি হাদিসে …

. সহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছেঃ

وفي صحيح مُسْلِم عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: إنما الإمام جنة، فإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً، وإذا قَالَ: سَمِعَ الله لمن حمده ، فقولوا : اللهم ربنا لَكَ الحمد . অর্থাৎ , 'ইমাম হচ্ছেন ঢাল স্বরুপ। যদি তিনি বসে নামাজ পড়েন , তবে তোমরাও বসে নামাজ পড়ো। যখন তিনি বলেন , 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ ', তোমরা বলোঃ 'আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ্ '।

একইভাবে জাবির (রাঃ) থেকে ইমাম দারাকুতনী (রঃ) হাদিস বর্ণনা করেছেনঃ

إنما الإمام جنة فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا -أخرجه الدارقطنى (1/423) . . অর্থাৎ , 'ইমাম ঢাল স্বরুপ , যখন তিনি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়েন , তোমরাও দাঁড়িয়ে পড়ো। যখন তিনি বসে নামাজ পড়েন তখন তোমরা বসে নামাজ পড়ো '। .

কে আছে বলবে…

…এই হাদিস দুটিতে কি রাষ্ট্রপ্রধানের শর্ত বোঝানো হয়েছে ?

…এখন কি দাঁড়িয়ে নামাজের জন্য রাষ্ট্রপ্রধানের উপস্থিতিকে কেউ শর্ত বানিয়ে নিবে ?

…এখন কি বসে নামাজের জন্য রাষ্ট্রপ্রধানের উপস্থিতিকে কেউ শর্ত বানিয়ে নিবে ?

… কি নামাজে 'আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ্ ' বলার জন্য কেউ রাষ্ট্রপ্রধানের উপস্থিতিকে কেউ শর্ত বানিয়ে নিবে ? . আজব যুক্তি ! আজব দলীল! আজব ফিকহ!!

— —

খ) জনৈক কল্যাণকামী ভাই বিপরীতে দেখিয়েছিলেন বিভিন্ন মুহাদ্দিস 'ইমাম ' অর্থ রাষ্ট্রপ্রধান দেখিয়েছেন। তাই হাদিসের অর্থে ইমাম অর্থ রাস্ট্রপ্রধানকেই খাস করে কোনো ভুল করা হয়নি।

যদিও জিহাদের জন্য রাষ্ট্রপ্রধান জরুরী এই অদ্ভুত শর্তারোপ করা হয়েছে।

আমরা জানি যে, ইমাম অর্থ নেতা যা একটি ব্যাপক শব্দ। যার মানে -

খলিফা, সফরের ইমাম, সালাতের ইমাম, হজ্জের ইমাম, জিহাদের ইমাম, রাষ্ট্রের ইমাম অনেক কিছুই হতে পারে।

তাই উক্ত হাদিসের ইমাম অর্থ রাস্ট্রপ্রধানই হবে অন্য অর্থ হবে না এটা ভুল।

কারণ ঐ হাদিসের ব্যখ্যায় কেউ রাষ্ট্রপ্রধানও করেছেন আবার কেউ খলিফাও করেছেন।

অথচ সকল রাষ্ট্রপ্রধান খলিফা নয়।

আর- শায়খ আলবানির মতে জিহাদের জন্য খলিফা শর্ত। শুধু রাস্ট্রপ্রধান হলেই হবে না। (দেখুন- ফিতনাতুত তাকফির)

অর্থাৎ, ইমাম অর্থ রাস্ট্রপ্রধাণের আলোচনা মুহাদ্দিসিনরা আমভাবে করেছেন।
খাসভাবে ঐ হাদিসের ইমাম বলতে শুধু খলিফাই হবে এমন না।

এমন খাসভাবে অর্থ নিয়ে নিলে তো সৌদির ‘জিহাদ’, সাইয়েদ আহমাদ শহিদের জিহাদ (যেসব জিহাদকে খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গির রহঃ নিজেও জিহাদ মনে করেন, সন্ত্রাসী না) সবই সন্ত্রাস। এবং শায়খ রহঃ নিজেও সন্ত্রাসের উস্কানিদাতা হিসেবে পরিগণিত হোন।
আল্লাহ সহজ করুন।

এরই প্রেক্ষিতে বলা হয়েছিল,

একটি হাদিসের অর্থ এভাবে খাসভাবে রাস্ট্রপ্রধাণ সাব্যস্ত করে জিহাদের জন্য রাষ্ট্রের শর্ত আরোপ করা উচিৎ হয়নি।

কেননা ইমাম শব্দটি কখনো কখনো সেনাপতির ক্ষেত্রেও ব্যবহার হতে পারে।

দেখুন নিম্নোক্ত হাদিসটি যা উল্লেখ করেছেন ইমাম হাকিম তাঁর মুস্তাদরাকে,

الغزو غزوان فأما من ابتغى وجه الله و #أطاع_الإمام و أنفق الكريمة و ياسر الشريك و اجتنب الفساد فإن نومه و نبهه أجر كله و أما من غزا فخرا و رياء و سمعة و عصى الإمام و أفسد في الأرض فإنه لن يرجع بكفاف

(সনদঃ মুসলিমের শর্তে সহিহ)

ব্যখ্যায় أطاع الإمام ব্যাখ্যায় ইমামের অর্থ এসেছে "যার আদেশ মানা হয়। "

(التنوير شرح الجامع الصغير)

এখানে বাহ্যত বোঝাই যাচ্ছে যে, এখানে ইমাম বলতে যুদ্ধের ইমাম তথা সেনাপতির কথা বলা হচ্ছে।

না বুঝে থাকলে হাদিসের প্রথম অংশ দেখা উচিৎ।

হাদিসটির শুরুতেই বলা হয়েছে الغزو غزوان অর্থাৎ গাজওয়া বা যুদ্ধ ২ প্রকার।

তাই - এখন কেউ যদি এই হাদিসে ইমাম অর্থ কেবলমাত্র এবং একমাত্র সেনাপ্রধাণ সাব্যস্ত করে এই অর্থ খাস করে দেয় — "যে ই আদেশ দেয় সে ই ইমাম। " এবং এই ফিকহ প্রয়োগ করে যে, আদেশ করার মত কেউ থাকলেই হলো অর্থাৎ সেনাপতি বানানোর মত কেউ থাকলেই হলো-; জিহাদ করা যাবে। তাহলে কি তা সহিহ বুঝ হবে?

কেননা যদি শার'ঈ ইমাম বিদ্যমান থাকে আর তিনি মাসলাহা'র জন্য ইকদামি/ আক্রমণাত্মক/ফরযে কিফায়া জিহাদ থেকে দূরে থাকেন তবে বিচ্ছিন্ন কারো জন্য আনুগত্য ভঙ্গ করে জিহাদে বের হওয়া হারাম। তা গুনাহের কাজ হবে, জিহাদ নয়। দেখুন -

قال ابن حبيب سمعت أهل العلم يقولون إن نهى الإمام عن القتال لمصلحة حرمت مخالفته إلا أن يزحمهم العدو

"ইবনে হাবীব রহ. বলেন, আমি আহলে ইলমদেরকে বলতে শুনেছি, ইমাম কোন মাসলাহাতের প্রতি লক্ষ্য করে কিতাল করতে নিষেধ করলে তার বিরুদ্ধাচরণ করা হারাম। তবে যদি শত্রু আক্রমণ করে বসে তাহলে ভিন্ন কথা।

[ফাতহুল আলিয়্যিল মালিক : ৩/৩]

এছাড়াও, বিভিন্ন সেনাদলের প্রধানকেও ইমাম বলা হয় এটা তো সকলেরই জানা বিষয়। যেমন সাহাবী আবদুল্লাহ বিন জাহশ রাদিঃ কে বলা হয় প্রথম আমিরুল মু'মিনিন। কেন?

কারণ তিনি প্রথম প্রেরিত মুসলিম সেনাদলের আমির ছিলেন।

দেখুন- ডক্টর আব্দুর রহমান রাফাত পাশা রহঃ’র “সুওয়ারিম মিন হায়াতুস সাহাবা” (বাংলা অনুবাদেও উক্ত কথাটি পাবেন)।

— -

তাই ইমামের অর্থ নিজের সুবিধামতো বসিয়ে সুবিধা মতো শর্তারোপ করা সহিহ হয়নি তা বোঝানো গেল আশা করি। তাড়াহুড়াপ্রবণ না হয়ে একাধিকবার পড়লে উত্তর পাওয়া যাবে। লেখা পড়েই উত্তর লিখতে বসলে আলোচনার পয়েন্টগুলো মাথার উপর দিয়ে যাবে এবং আলোচনা করাই হয় নি মনে করাটা স্বাভাবিক।

যদিও পূর্বের আলোচনাই যথেষ্ট ছিল তবুও বোঝার সুবিধার্থে আরও একটু আলোচনা করা হলো।

আল্লাহ তা’আলা সহজ বিষয় সহজে বোঝার তাওফিক দান করুন। আমিন।

পর্ব ৭ঃ

শায়খ রহঃ জিহাদের জন্য রাষ্ট্রেপ্রধানের অস্তিত্বের শর্ত আরোপের পক্ষে দলীল টানতে গিয়ে লেখেন-

"মুআবিয়ার (রা) মৃত্যুর পরে কূফাবাসীগণ ইমাম হুসাইনকে (রা) রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে বাইয়াত করে পত্র লিখেন।

তারা ইমাম হুসাইনকেই বৈধ রাষ্ট্রপতি হিসেবে গ্রহণ করেন এবং ইয়াযিদের রাষ্ট্রক্ষমতার দাবি অস্বীকার করেন। (১)

এভাবে মুসলিম সমাজ দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হয়। (২)

আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইরের (রা) ক্ষেত্রেও বিষয়টি একইরূপ ছিল। (৩)"

(ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ, পৃষ্ঠা ৪৯)

১) প্রথমত,

ন্যূনত্বম ইসলামী জ্ঞান রাখা কোনো ব্যক্তিও যে এসব কথা বলতে পারে এটা আমার জানা ছিল না… রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া, রাষ্ট্র ইত্যাদির ব্যাপারে ইসলামে আলাদা রুলিং আছে… কাউকে শুধু বাইয়াত দিয়ে কিছু ব্যাক্তি চিঠি লিখে দিলেই উক্ত ব্যাক্তি রাষ্ট্রপতি হয়ে যায়!!?

এমনকি হুসাইন রাদিঃ সেখানে ছিলেনও না… কই পেলেন এমন ব্যখ্যা তিনি… !!?

বরং মুরজিয়া মাদখালিদের বইয়ে তো এর উল্টো কথাই লেখা… আগ্রহী ব্যক্তিদের ইমাম মাওয়ারদি রহঃ লিখিত “আহকামুস সুলতানিয়া” পড়ার আহ্বান জানাচ্ছি… ইংরেজিতেও পাবেন ইনশা’আল্লাহ।

#দ্বিতীয়ত, জিহাদের জন্য রাষ্ট্রপ্রধান শর্ত হলে, কুফাবাসীরা যখন বায়াত উঠিয়ে নেন (অর্থাৎ রাষ্ট্র (মরহুমের নব-আবিষ্কৃত পরিভাষায়) তখন আর নেই) তারপর কারবালায় হুসাইন রাদিঃ যুদ্ধ করেছিলেন। সেটা কীভাবে জায়েজ হয়!!!!!

কেননা, ততক্ষণে কুফার ব্যক্তিরা সাইয়িদুনা হুসাইন রাদিঃ এর উপর থেকে বায়াত উঠিয়ে নিয়েছে… অর্থাৎ হুসাইন রাদিঃ কারবালায় রাষ্ট্রপ্রধান(!) হিসেবে জিহাদ করেন নি…

এছাড়াও, মরহুম শায়খের মতে কুফার রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে হুসাইন রাদিঃ যুদ্ধ করেছেন। অথচ, হুসাইন রাদিঃ এর সাথে কুফাবাসীরা তো ছিলই না!!!! একথা শায়খ রাহিমাহুল্লাহ স্বয়ং নিজেও বলেছেন যে, হুসাইন বিন আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু’র সাথে কুফাবাসীর সাক্ষাৎও হয়নি, কারবালার প্রান্তরে কুফাবাসীর কেউ সেখানে ছিলও না। তাহলে হুসাইন রাদিঃ কীভাবে রাস্ট্রপ্রধান হলো!?!

শায়খ একথাও বলেছেন যে, কারবালার প্রান্তরে যুদ্ধ হওয়ার আগেই কুফাবাসী বায়াত উঠিয়ে উবাইদুল্লাহ বিন জিয়াদের আনুগত্য করে। দেখুন শায়খের পূর্ণ বয়ানঃ https://www.youtube.com/watch?v=fu3D1--j7iE

সুবহান’আল্লাহ! বিষয়টি জানা সত্ত্বেও, নিজে প্রচার করা সত্ত্বেও এই বইটিতে এমন আশ্চর্য তথ্য কীভাবে তিনি উল্লেখ করলেন!!!!? জিহাদের পথে নিবৃত্ত করতঃ আরোপিত আশ্চর্য শর্তে বৈধতা দানে ইসলামের ইতিহাসই পাল্টে ফেলার মানে কি হতে পারে!!?

আল্লাহ তা’আলা শায়খকে ক্ষমা করে জান্নাতে দাখিল করুন। আমিন।

বাস্তবিকই, এই বক্তব্যটি এতই অদ্ভুত যে… আমি হাসব না কাঁদব বুঝেই উঠতে পারছিলাম না অনেকক্ষণ থেকে…

২) দুটি রাষ্ট্র, অর্থাৎ কুফার আর ইয়াজিদের অধীন হিজাজ, সিরিয়াসহ বাকি মুসলিম ভূমির মাঝে যুদ্ধ হয়েছে!?!? কারবালার প্রান্তরে দুটি রাষ্ট্র যুদ্ধ করেছিল?!

মানে… আল্লাহ্ মাফ করুন… কী বলব!! ১ম পয়েন্টেই ক্লিয়ার হয়েছে।

অথচ শায়খ নিজেই উনার লেকচারে বলেছেন, কারবালার প্রান্তরে উবাইদুল্লাহ জিয়াদের বাহিনীর সামনে শুধু হুসাইন রাদিঃ’র পরিবার উপস্থিত ছিলেন। তো শায়খের ভাষ্য অনুযায়ী- এসকল নিরীহ নারী-শিশু কুফার সেনাবাহিনী? সুবহান’আল্লাহ!!

আরও একটি বিষয়- হুসাইন রাদিঃ’র যুদ্ধকে আমাদের ইমামদের সকলেই জিহাদ হিসেবেই গণ্য করেছেন…

এবং ইতিহাসের সেরা বীরত্বের ঘটনাসমূহের একটি হিসেবেই উল্লেখ করেছেন… নিছক যুদ্ধ-বিগ্রহ না… . এগুলো সাহাবাদের ব্যাপারে চূড়ান্ত বেয়াদবিমূলক কথা মনে হয়েছে আমার কাছে…

উপরে উল্লেখিত ভিডিওতে শায়খ রাহিমাহুল্লাহ নিজেও একথা বলেছেন অথচ বইয়ে কী ভাষা তিনি ব্যাবহার করলেন!!? হায় আল্লাহ!

৩) কখনোই আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রাদিঃ রাস্ট্রপ্রধান হিসেবে যুদ্ধ করেন নি… তিনি উমাইয়া খেলাফতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তারপর হিজাজ দখল করেন… এরপর সেখানে আলাদা খিলাফাহ ঘোষণা করেন।

সুবহান’আল্লাহ আশ্চর্য হতে হয়!! যা ইচ্ছা বলা হয়েছে এমন একটা বই মুজাহিদিনদের বিরুদ্ধে মারণাস্ত্রে পরিণত হয়েছে। আল্লাহু আকবার!

(আরও জানতে আকবর শাহ নজিরাবাদি লিখিত "তারিখে ইসলাম", জয়নুল আবেদিন মিরাঠী লিখিত "খিলাফতে বনু উমাইয়া" পড়ার অনুরোধ রইলো- উভয়টিই সহজলোভ্য বই।)

খুবই অদ্ভুত আর্গুমেন্ট এসব... ঠিক কী কারণে জেনেশুনে শায়খ রহঃ এসব কাজ করতে গেলেন তা আল্লাহই ভালো জানেন। আমার জানা নাই, এসব বিষয়কে ইলমি খিয়ানত বলা না হলে আর কোন বিষয়কে বলা হবে!!?

এই দায়িত্ব পাঠকের উপরই অর্পিত হলো, কেন শায়খ রহঃ স্রেফ নিজের মনগড়া শর্তকে প্রমাণ করতে গিয়ে এহেন জবরদস্তি করলেন!! . আমাদের মাফ করুন... আমিন।

পর্ব ৮ঃ

শায়খ খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গির রহঃ 'ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ' বইয়ের পৃষ্ঠা ৪৮ এ একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন এবং তার অনুবাদ করেছেন,

مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

"যদি কোনো ব্যক্তি মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিক বা মুসলিম দেশে অবস্থানকারী অমুসলিম দেশের কোনো অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করে তবে সে জান্নাতের সুগন্ধও লাভ করতে পারবে না, যদিও জান্নাতের সুগন্ধ ৪০ বৎসরের দুরত্ব থেকে লাভ করা যায়।"

.

হাদিসটি উল্লেখপূর্বক তিনি বলেছেন,

"বিধর্মীকে হত্যা তো দূরের কথা, বিধর্মীর সাথে অভদ্র আচরণ করতেও নিষেধ করা হয়েছে।"

— — —

শায়খ রহঃ এখানে হাদিসটিতে উল্লেখিত مُعَاهِدً এর অর্থ বোঝার ক্ষেত্রে স্পষ্ট ভ্রান্তির শিকার হয়েছেন অথবা ইচ্ছাকৃত ভুল করেছেন (আল্লাহ তা'আলা উনাকে ক্ষমা করুন)।

হাদিসে উল্লেখিত مُعَاهِدً/মু'আহিদ শব্দের অর্থ হচ্ছে চুক্তিবদ্ধ কাফির।

ইংরেজি অনুবাদ দেখুনঃ

১) Allah’s Messenger (sallallaahu ‘alaihi wasallam)said, Whoever killed a person having a treaty_of_protection with Muslims, shall not smell the scent of Paradise, though its scent is perceived from a distance of forty years.

২)Allah’s Messenger (sallallaahu ‘alaihi wasallam)said, “Whoever killed a Mu’ahid (a person who is granted the pledge_of_protection by the Muslims) shall not smell the fragrance of Paradise though its fragrance can be smelt at a distance of forty years (of traveling).”

— -

দেখুন বাংলা অনুবাদ ->

.

১) আবদুল্লাহ ইবনে ‘আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন , রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম যিম্মীকে হত্যা করবে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। অথচ তার সুগন্ধ অবশ্যই চল্লিশ বছরের দূরত্ব থেকেও পাওয়া যাবে। (hadithbd.com)

.

২) নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, ‘যে ব্যক্তি কোন জিম্মীকে কতল করে, সে জান্নাতের ঘ্রাণ পাবে না। যদিও জান্নাতের ঘ্রাণ চল্লিশ বছরের দূরত্ব হতে পাওয়া যাবে। ’ (ihadis.com)

— -

তো কই হাদিসের প্রকৃত অর্থ আর কই শায়খ রহঃ এর করা অর্বাচীন অর্থ। দৃষ্টিশক্তি ও বোধশক্তি আছে এমন যে কারো জন্য এপর্যন্ত আলোচনাই যথেষ্ট …

তথাপি কিছু ব্যক্তি হয়তো অপব্যাখ্যা করে “দলীলের নামে গোঁজামিল” হাজির করতে পারে তাই আরেকটু স্পস্ট করা হচ্ছে।

শায়খ মু’আহিদ শব্দের ২টি অর্থ করেছেন-

ক) মুসলিম দেশে অবস্থানকারী ঐ দেশেরই অমুসলিম নাগরিক।

খ) মুসলিম দেশে অবস্থানকারী ভিন্ন দেশের অমুসলিম নাগরিক।

কিন্তু,

=> মুসলিম দেশে অবস্থানকারী কাফির এই হাদিসের আওতায় পরবে না যদি না সে চুক্তিবদ্ধ হয়।

=> অমুসলিম দেশের কোনো অমুসলিম নাগরিক মুসলিম দেশে আসলো কিন্তু চুক্তি ছাড়া, সেও এই হাদিসের আওতাভুক্ত হবে না।

=> আবার, মুসলিমদের ভূমিতে অবস্থান করে না এমন কাফিরও এই হাদিসের আওতাভুক্ত হবে যদি সে মুসলিমদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে থাকে।

তো কোনো দিক থেকেই এই ভ্রান্তির স্বপক্ষে প্রমাণ হাজির করার সুযোগ নেই।

শায়খ রহঃ’র এই অর্থের দূরবর্তী ব্যাখ্যা করেও এটা প্রমাণ করা সম্ভব না যে, উনি হাদিসের অর্থ পাল্টে দেন নি।

শুধু অর্থ নয়, এতে দ্বীনের একটি মূলনীতিই পুরোপুরি পাল্টে যায়।

শায়খের সংজ্ঞা গ্রহণ করলে, ফিলিস্তিন দখল করে থাকা ইহুদিরাও মু’আহিদ (মুসলিম দেশে তারা ৬০বছরেরও অধিক সময় ধরে বাস করা অমুসলিম নাগরিক) এবং ইরাকে দশ লক্ষাধিক নারীপুরুষ ও শিশু হত্যাকারি আমেরিকানরাও মু’আহিদ (মুসলিম দেশে অবস্থানকারী ভিন্ন দেশের অমুসলিম নাগরিক)।

মুসলিম দেশে অবস্থানকারী আগ্রাসী কাফিররা মু’আহিদ নয়। এব্যাপারে আরও জানতে পড়ুনঃ

http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_23560.html

— -

দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে,

এমন কাজ পূর্বে বেরলভিদের করতে দেখেছি যে, তারা দরুদের অনুবাদে মিলাদ/কিয়াম লিখে “মিলাদ/ কিয়াম করা” মুস্তাহাব সাব্যস্ত করে থাকে। কারণ দরুদ আর কিয়াম নাকি একই। এব্যাপারে তাদের কাছে আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভি রহঃ’র পক্ষ হতে তাদের কাছে দলীলও আছে …

তারা যে রকম কিয়াম আর দরুদ একই মনে করে দরুদের অর্থ মিলাদ/কিয়াম করা সম্পূর্ণ বৈধ মনে করেন তেমনই কিছু সহিহ আকিদার ভাইদেরকে পেলাম যারা নিজেদের স্বপক্ষের দলীল জবরদস্তিমূলকভাবে প্রমাণ করতে কবরপূজারীদের অনুসরণে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না।

আল্লাহ তা’আলা সবাইকে সহিহ বুঝ দান করুন। আমিন।

(চলমান ইনশা’আল্লাহ)